Siddhanta's International Journal of Advanced Research in Arts & Humanities
Vol. 3, No. 4, March - April 2026

প্রকৃতিবোধ: রবীন্দ্রনাথ থেকে বিভূতিভূষণ - ঐতিহ্য, রূপান্তর ও বহুমাত্রিকতা

নৈঋতি বিশ্বাস

গবেষক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, সিকম্ স্কিলস্ ইউনিভার্সিটি

ড. অনাথ বন্ধু চ্যাটার্জী

তত্ত্বাবধায়ক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, সিকম্ স্কিলস্ ইউনিভার্সিটি

বাংলা সাহিত্যে প্রকৃতির উপস্থিতি এক দীর্ঘ ও গভীর ঐতিহ্যের ধারক। প্রকৃতি কখনও কাব্যের অলঙ্কার, কখনও মানবমনের প্রতিবিম্ব, আবার কখনও স্বয়ং এক জীবন্ত সত্তা হিসেবে নিজেকে উজাড় করে দেয়। এই প্রকৃতিবোধের আধুনিক রূপ গঠনে সর্বাগ্রে যাঁর নাম উচ্চারিত হয়, তিনি বহুমুখী সৃজন প্রতিভার অধিকারী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আর তাঁর উত্তরাধিকার বহন করে প্রকৃতি চেতনার জগতকে এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছেন প্রকৃতির মানসপুত্র বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁদের রচনায় প্রকৃতি কেবল বাহ্যজগতের বর্ণনা নয়, বরং তা এক গভীর দার্শনিক, নান্দনিক এবং আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।

" প্রকৃতির মধ্যে বিপুলতার ও রহস্তের সন্ধান এবং মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির যোগ আবিষ্কার আমাদের দেশে সফলতা ও ব্যাপকতায় রবীন্দ্রনাথে প্রথম হলেও এই ধারার শুরু কিন্তু তাঁরও আগে থেকে। ইংলণ্ডে উনিশ শতকীয় রোম্যা-ন্টিক কবিগোষ্ঠীর কাছ থেকে বিহারীলালই এই ধারা সর্বপ্রথম গ্রহণ করেন। বিহারীলালের কাছ থেকে পান রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে রবীন্দ্রোত্তর গোষ্ঠী। রবীন্দ্রোত্তর কথাশিল্পীদের মধ্যে আবার বিভূতিভূষণই এই ধারা সবচেয়ে অধিক পরিমাণে গ্রহণ করেন।" ১

প্রসঙ্গত বলতে হয়, রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিচেতনা বাংলা সাহিত্যকে নতুন দিগন্তে পৌঁছে দেয়। তাঁর পূর্ববর্তী যুগে প্রকৃতি সাহিত্যে উপস্থিত থাকলেও তা ছিল সীমিত এবং অনেকাংশে অলঙ্কারনির্ভর। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতিকে মানবজীবনের সঙ্গে একাত্ম করে দেখেছেন। তাঁর কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধে প্রকৃতি কখনও মানবমনের সহচর, কখনও বা তার প্রতিপক্ষ, আবার কখনও তা এক নীরব সঙ্গী ; যা মানুষের সুখ-দুঃখের সঙ্গে সমানভাবে সম্পৃক্ত হয়ে আছে। পদ্মার বিস্তীর্ণ তীর, কাশবনের স্নিগ্ধ দোলা, বর্ষার আকাশ, শরতের নির্মল প্রকাশ - এই সমস্ত প্রাকৃতিক উপাদান তাঁর রচনায় এক জীবন্ত অনুভূতির জন্ম দেয়।

" প্রকৃতির মাঝখানে এক নিগূঢ় প্রাণসত্তার বিশ্বাসে বিভূতিভূষণের ওপরে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব বা উভয়ের মনোভঙ্গির প্রধানতঃ মিল থাকলেও রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতির সঙ্গে বিভূতিভূষণের প্রকৃতির কিছুটা তফাৎ আছে।" ২

রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিবোধের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির গভীর আত্মীয়তার উপলব্ধি। তাঁর কাছে প্রকৃতি কোনো নিষ্প্রাণ বস্তু নয়, বরং তা এক সহানুভূতিশীল সত্তা, যা মানুষের জীবনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত। 'ছিন্নপত্র', 'বসুন্ধরা', 'মাটির ডাক' প্রভৃতি রচনায় তিনি প্রকৃতির মধ্যে এক বিশ্বজনীন চেতনার সন্ধান করেছেন। তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রকৃতিকে কেবল রোম্যান্টিকতার সীমায় আবদ্ধ রাখেনি, বরং তাকে দার্শনিক ও তত্ত্বনির্ভর উচ্চতায় উন্নীত করেছে।

তবে এই প্রকৃতিবোধের সূত্রপাত সম্পূর্ণভাবে রবীন্দ্রনাথের হাতেই নয়।

উনিশ শতকের ইংরেজ রোম্যান্টিক কবিদের প্রভাব, বিশেষত ওয়ার্ডসওয়ার্থের প্রকৃতিচেতনা, বাংলা সাহিত্যে এক নতুন ধারার সংযোজন ও প্রতিষ্ঠা বলা যায়। এই ধারার প্রথম পূজারী ও সাধক ছিলেন বিহারীলাল চক্রবর্তী, যিনি প্রকৃতির মধ্যে এক নান্দনিক ও আবেগময় জগতের সন্ধান পেয়েছিলেন এবং সেই জগতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপনে তিনি অনেক বড় ভূমিকা পালন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সেই ধারাকে আরও বিস্তৃত ও গভীর করে তুলেছিলেন। তাঁর

কাছে প্রকৃতি হয়ে ওঠে মানবজীবনের পরিপূরক, যেখানে মানুষ ও প্রকৃতি এক অখণ্ড সত্তায় পরিণত হয়।

" আধুনিক কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে বিভূতিভূষণ যেমন প্রকৃতির রূপে সর্বাপেক্ষা মুগ্ধ, আধুনিক কবিদের মধ্যে তেমনি জীবনানন্দ। ফলে, আধুনিক সাহিতো প্রকৃতির কথ উঠলে এই দুটি নাম একসঙ্গে মনে না হয়ে পারে না। বিভূতিভূষণের সাহিত্যে যেমন সোঁদালিফুল, শিমূল, ডাঁসা খেজুর, সোনাডাঙা মাঠ, বৌকথাকও, পাপিয়া - জীবনানন্দের কবিতাতেও তেমনি হিজলের ছায়া, বটের জাল ফল, ঘাস, রোদ, মাছরাঙা, বুনোহাঁস প্রভৃতির ভিড়।" ৩

বলাবাহুল্য, এই ধারারই পরবর্তী ও সর্বোত্তম প্রকাশ উন্নীত হয়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যে। একথা অনস্বীকার্য যে, বিভূতিভূষণের প্রকৃতিবোধ রবীন্দ্রনাথের থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হলেও তার স্বর ও রূপ ভিন্ন। তিনি প্রকৃতিকে শুধু মানবজীবনের সহচর হিসেবে দেখেননি, বরং তাকে এক স্বয়ংসম্পূর্ণ, রহস্যময় ও প্রাণময় জগৎ হিসেবে অনুভব করেছেন। ঋতুচক্রের মতো তিনি পরতে পরতে আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁর রচনায় প্রকৃতি কখনও মধুর, কখনও ভয়াল, কখনও বা এক গভীর নিঃসঙ্গতার প্রতীক হয়ে ধরা দিয়েছে।

উল্লেখ্য, 'পথের পাঁচালী'-তে নিশ্চিন্দিপুরের পল্লিপ্রকৃতি যেমন অপু ও দুর্গার জীবনের সঙ্গে মিশে গেছে, তেমনি 'আরণ্যক'-এ অরণ্যের বিশালতা ও রহস্যময়তা মানুষের অস্তিত্বকে এক নতুনভাবে উপলব্ধির সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। প্রকৃতির যথার্থ দোসর বিভূতিভূষণের প্রকৃতি শুধু মানবসমাজের পরিপূরক নয়, বরং তা এক স্বাধীন সত্তা, যার নিজস্ব নিয়ম ও ছন্দ রয়েছে। তাঁর বর্ণনায় প্রকৃতির ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র উপাদানও জীবন্ত হয়ে ওঠে - গাছপালা, পাখি, নদী, অরণ্য সহ সবকিছুই যেন এক বিশাল জীবনের অংশ হিসেবে গান গেয়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথ ও বিভূতিভূষণের প্রকৃতিবোধের মধ্যে সাদৃশ্য থাকলেও

উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গি,প্রকাশ ও মনোযোগের মধ্যে মৌলিক পার্থক্যও রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি অধিকতর সংযত, পরিমার্জিত এবং দার্শনিক। তিনি প্রকৃতিকে একটি নির্দিষ্ট ভাবনা ও তত্ত্বের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছেন। অন্যদিকে বিভূতিভূষণের প্রকৃতি অনেক বেশি স্বতঃস্ফূর্ত ও বিস্ময়ময়। তাঁর রচনায় প্রকৃতির বর্ণনা একটি সরাসরি অনুভূতির ফল, যেখানে কোনো কৃত্রিমতা বা পরিমার্জনের চাপ নেই। দোলাচল চিত্ততা নেই, কেবলই গভীর এক মগ্নতা ভিড় করে আছে।

বিভূতিভূষণের প্রকৃতিবোধের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল বিস্ময়। তিনি বিশ্বাস করতেন যে প্রকৃতির মধ্যে এক অনির্বচনীয় রহস্য রয়েছে, যা মানুষের বোধের বাইরে। এই রহস্যের সন্ধানই তাঁর রচনার মূল চালিকাশক্তি। তাঁর নিজের ভাষায়, প্রকৃতির সেই রহস্যময় অসীমতা, দূরধিগম্যতা, বিরাটত্ব এবং গা-ছমছমে সৌন্দর্য সহ বিপুল অনুষঙ্গ মানুষের মনে এক গভীর অনুভূতির জন্ম দেয়। এই অনুভূতি কখনও ভয়ের, কখনও বিস্ময়ের, কখনও বা এক গভীর শান্তির। এপ্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য উদ্ধৃতি হলঃ

" অন্নদাশঙ্কর যেমন একজন বিরল সাহিত্যিক যার সান্নিধ্যে গিয়ে বসলে আধ্যাত্মিকতার এক সুঘ্রাণ পাওয়া যায়, তেমনি আর একজনকে দেখেছি। সে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।"৪

ইংরেজ কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের সঙ্গে বিভূতিভূষণের তুলনা এই প্রসঙ্গে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। উভয়েরই রচনায় প্রকৃতি এক আধ্যাত্মিক শক্তি হিসেবে উপস্থিত। তবে ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রকৃতিকে কখনও নৈতিক শিক্ষকের রূপে দেখেছেন, "Let nature be your teacher" - যেখানে প্রকৃতি মানুষের নৈতিক উন্নতির পথপ্রদর্শক। বিভূতিভূষণের কাছে প্রকৃতি তেমন কোনো শিক্ষাদাতা নয়; বরং তা এক অন্তহীন বিস্ময়ের উৎস। তাঁর কাছে বিস্ময়ই দর্শনের মূল, এবং সেই বিস্ময়ের মধ্যেই প্রকৃতির আসল তাৎপর্য নিহিত।

" হাডসনও তাঁর সাহিত্যের এক স্থানে এই ধরনের কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন-আকাশ, মাটি, নক্ষত্র, পশুপক্ষী কিছুই তাঁর কাছে অপরিচিত লাগে না, কারণ তিনি এদেরই একজন। 'পথের পাঁচালী'র সোনাডাঙা মাঠের অথবা 'আরণ্যক'-এর সরস্বতী কুণ্ডীর তীরের বর্ণনায় বিভূতিভূষণ যে রূপময়ী প্রকৃতির চিত্র এঁকেছেন, 'Green Mansions'-এ দক্ষিণ আমেরিকার ট্রপিকাল অরণ্যের বর্ণনায় হাডসনও সেই রূপময়ী প্রকৃতির চিত্র এঁকেছেন। এই রূপময়ী প্রকৃতির পর্যবেক্ষণে ও বর্ণনায় মিল থাকায় বিভূতিভূষণ ও হাডসনকে এক আসনে বসান হয়। পার্থক্য এই, বিভূতিভূষণ রূপময়ী প্রকৃতির পর্যবেক্ষণ ও চিত্রাঙ্কন করেও প্রকৃতির নিগূঢ় প্রাণসত্তার সন্ধান দিয়েছেন। হাডসন কিন্তু তা করেন নি।..." ৫

একইভাবে হাডসন ও হার্ডির সঙ্গে তুলনা করলে বিভূতিভূষণের প্রকৃতিবোধের বৈশিষ্ট্য আরও স্পষ্ট হয়। হাডসনের মতো তিনিও প্রকৃতির রূপমাধুর্য ও মানুষের সঙ্গে তার সম্পর্ককে গুরুত্ব দিয়েছেন, কিন্তু বিভূতিভূষণ সেইসঙ্গে প্রকৃতির অন্তর্লীন প্রাণসত্তার সন্ধান করেছেন। হার্ডির প্রকৃতি যেখানে নিষ্ঠুর ও নিয়তিনির্ধারিত, বিভূতিভূষণের প্রকৃতি সেখানে প্রধানত কোমল ও সহানুভূতিশীল, যদিও কখনও কখনও তার মধ্যে ভয়ালতার আভাসও দেখা যায়।

বাংলা সাহিত্যের আধুনিক পর্যায়ে জীবনানন্দ দাশের প্রকৃতিবোধের সঙ্গে বিভূতিভূষণের সম্পর্কও উল্লেখযোগ্য।ও স্নিগ্ধ হয়ে দেখা দিয়েছে। প্রমথ বিশী লিখেছেন, "পাহাড়-পর্বত, অরণ্য ও বন্ধুর ভূখণ্ড-কোনটারই ভীমকান্ত সৌন্দর্যকে কবি দেখান নাই, কারণ তিনি দেখেন নাই। তাহাদের স্নিগ্ধ ও সুন্দর দিকটাই তিনি দেখিয়াছেন ও আঁকিয়াছেন।" ৬

উভয়ের রচনায় প্রকৃতি চিত্ররূপময় এবং স্মৃতিনির্ভর। তবে বিভূতিভূষণের প্রকৃতি যেখানে আধ্যাত্মিক ও প্রাণময়, জীবনানন্দের প্রকৃতি সেখানে অধিকতর ইন্দ্রিয়নির্ভর এবং নস্ট্যালজিক। তাঁর কবিতায় প্রকৃতি এক বিষণ্ন, নির্জন এবং প্রায়শই অস্তিত্বহীনতার

অনুভূতি বহন করে। বিভূতিভূষণ যেখানে প্রকৃতির মধ্যে এক চিরন্তন সত্তার সন্ধান করেছেন, জীবনানন্দ সেখানে খুঁজে পেয়েছেন এক হারিয়ে যাওয়া সময়ের স্মৃতি ও বেদনা।

প্রকৃতিবোধের এই ধারাবাহিকতা বাংলা সাহিত্যে এক বহুমাত্রিক রূপ নির্মাণ করেছে। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতিকে যে দার্শনিক ও মানবিক উচ্চতায় উন্নীত করেছিলেন, বিভূতিভূষণ তা আরও বিস্তৃত ও গভীর করে তুলেছেন তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত ও বিস্ময়ময় দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে। তাঁদের এই অবদান বাংলা সাহিত্যকে এক নতুন মাত্রা প্রদান করেছে, যেখানে প্রকৃতি আর কেবল পটভূমি নয়, বরং তা এক সক্রিয় ও প্রাণবন্ত চরিত্র।

পরিশেষে বলা যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক' উপন্যাসের একটি অংশ এক্ষেত্রে কখনোই স্মরণাতীত হতে পারে না। চিরকাল বড় বেশি প্রাসঙ্গিক। " অনেকদিন ধরিয়া প্রকৃতির সেবা না করিলে কিন্তু সে দান মেলে না। অনন্যমনা হইয়া প্রকৃতিকে লইয়া ডুবিয়া থাকো, তাঁর সর্ববিধ আনন্দের বর, সৌন্দর্যের বর, অপূর্ব শান্তির বর তোমার উপর অজস্রধারে এত বর্ষিত হইবে, তুমি দেখিয়া পাগল হইয়া উঠিবে, দিনরাত মোহিনী প্রকৃতিরাণী তোমাকে শতরূপে মুগ্ধ করিবেন, নূতন দৃষ্টি জাগ্রত করিয়া তুলিবেন, মনের আয়ু বাড়াইয়া দিবেন, অমরলোকের আভাসে অমরত্বের প্রান্তে উপনীত করাইবেন।" ৭

তাহলেও মানুষ যে প্রকৃতিকে উপভোগের পরিবর্তে এর মুক্ত সৌন্দর্যকে ধ্বংস করছে, বিভূতিভূষণের বিশ্বাস তার ফলে প্রকৃতি একদিন মানুষের ওপর প্রতিশোধ নেবে, আবার আদিম অরণ্য ফিরে আসবে।" ফলে স্বীকার করতেই হয় যে,বাংলা সাহিত্যে প্রকৃতিবোধের বিকাশ একটি সৃজনশীল ও ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রকৃতি ধীরে ধীরে একটি গভীর জীবনদর্শনের রূপ লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথ ও বিভূতিভূষণের রচনায় এই প্রকৃতিবোধ তার পূর্ণতা লাভ করে - একদিকে দার্শনিক গভীরতা, অন্যদিকে স্বতঃস্ফূর্ত বিস্ময় - এই দুইয়ের সমন্বয়ে নির্মিত হয়েছে এক সমৃদ্ধ ও বহুমাত্রিক সাহিত্যিক জগৎ, যা আজও পাঠকের মনে মুগ্ধতা ও চিন্তার উদ্রেক করে।

তথ্যসূত্র:

1. সুশীলকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'বিভূতিভূষণ জীবন ও সাহিত্য ', জিজ্ঞাসা, কলকাতা ৯, ডিসেম্বর,১৯৮০, পৃষ্ঠা: ২১৭
2. তদেব,পৃষ্ঠা : ২১৮
3. তদেব, পৃষ্ঠা: ২২৩
4. কল্লোল যুগ, চতুর্থ প্রকাশ, পৃষ্ঠা: ১৭৩
5. সুশীলকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'বিভূতিভূষণ জীবন ও সাহিত্য ', জিজ্ঞাসা, কলকাতা ৯, ডিসেম্বর,১৯৮০, পৃষ্ঠা: ২২২
6. প্রমথনাথ বিশী,'বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প ', ভূমিকা
7. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'আরণ্যক '(৬ষ্ঠ মুদ্রণ), ৮০২, পৃষ্ঠা : ১১০